ইউনিট ২

প্রোক্যারিওটস্

ভূমিকা

কোষের সংগঠন অনুসারে উদ্ভিদ জগৎকে দুটি উপ-রাজ্যে (sub-kingdoms) ভাগ করা চলে। একটি উপ-রাজ্যকে বলে প্রোক্যারিওটস্ (procaryotes) আর অন্য উপ-রাজ্যটিকে বলা হয় ইউক্যারিওটস্ (eucaryotes)। প্রোক্যারিওটস্দের কোষের গঠন, ইউক্যারিওস্দের থেকে অনেক সরল। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত জীবের কোষের নিউক্লিয়াস সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়ার পর্দা দিয়ে আবৃত নয়, সে সমস্ত জীবকে প্রোক্যারিওটস বা আদিকোষী জীব বলে। আদি কোষের আয়তন সাধারণত ০.১-৩.০ মাইক্রম (μ)। রাইবোজোম ব্যতীত অন্য কোন ক্ষুদ্রাঙ্গ যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, লাইসোজোম, গল্গি বডি, আন্ত:প্লাজমিক জালি বিশেষতঃ নিউক্লিয়াস এতে দেখা যায় না এবং নিউক্লিওলাস অনুপস্থিত। এদের ক্রোমোজোম অত্যন্ত আদিম-মূলত বৃত্তাকার ডি.এন.এ (DNA)। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ফিশান (fission) বা অনুরূপ কোন এ্যা-মাইটোসিস (amitosis) কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে ঘটে। মাইকোপ্লাজমা (mycoplasma), প্লুরোনিউমোনিয়া-রূপ জীব ([Pleuro-Pneumonia Like Organisms], PPLO), নামক এককোষী জীব প্রোক্যারিওটস্-এর উদাহরণ। ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল অনেকটা উন্নততর প্রোক্যারিওটস্-এর অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ- ১ ঃ ভাইরাস (Virus) ঃ ইতিকথা, গঠন

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ভাইরাস কি এবং এর আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক পটভূমি বলতে পারবেন।
- এর রাসায়নিক গঠন বলতে পারবেন।
- ভাইরাস জীব না জড় তা নিরূপণ করতে পারবেন।
- এদের শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবেন।
- T_2- ব্যাকটেরিওফায্ এর বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভাইরাস কি?

What is Virus

ভাইরাস এক প্রকার অতি আণুবীক্ষণিক (ultra-microscopic) অকোষীর সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তু, যা কেবলমাত্র উপযুক্ত পোষক কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশেষ দেহে বিশেষ বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। উপযুক্ত পোষক কোষের বাইরে ভাইরাসে প্রাণের কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাসের ছবি তোলা সম্ভব।

ভাইরাসের ইতিকথা

History of Virus

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাস সম্বন্ধে জানা যায় লিখিত বর্ণনা ও অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে। তবে এর আগের বর্ণনা আছে মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলির মধ্যে রক্ষিত রাজা বাদশাহ্দের দেহে বসন্ত রোগের দাগের মধ্যে। প্রায় ২০০০ বছর আগে চীন দেশে বসন্ত রোগের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে আরব দেশে বসন্ত রোগ ছিল বলে জানা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের বহু পূর্বে উদ্ভিদের ভাইরাস রোগ সম্বন্ধে জানা ছিল কিন্তু তখন একে ভাইরাস রোগ হিসেবে সনাক্ত করা যায়নি।

উদ্ভিদ জগতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে চার্লস ই ইক্লুস (Charles I' Ecluse)-এর ব্রেকিং অব টিউলিপস" (Breaking of Tulips) রোগের বর্ণনায় প্রথম ভাইরাসের কথা জানা যায়। এরপর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ডানিয়েল র‍্যাবেল (Daniel Rabel) নামক একজন শিল্পী "থিয়েট্রাম ফ্লোরি" (Theatrum Florae) নামক পুস্তকে রোগাক্রান্ত টিউলিপ ফুলের ছবি আঁকেন।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে "ট্রেইট ডেস টিউলিপস" (Traite des Tulips) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম ব্রেকিং অব টিউলিপকে রোগ বলে বিবেচনা করা হয়।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে "আর্ট অব গার্ডেনিং" ("Art of Gardening") নামক পুস্তকে "জেসমিনাম" (Jesminum) ফুলের সংক্রামক ক্লোরোসিস রোগের ছবি দেখান হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে "Curl disease of Potato" (Leaf roll of Potato) কে "ডিজেনারেশন" (degeneration) বলে উল্লেখ করা হত; কিন্তু দেখা গিয়েছিল ঐ একই ভ্যারাইটির আলুর বীজগুলোকে সুমদ্রের পাড়ে বা পাহাড়ের উপরে চাষ করলে ডিজেনারেশন হয় না। তাই বিজ্ঞানীরা একে ডিজেনারেশন না বলে সংক্রামক রোগ বলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অ্যাবুটিলন (abutilon) (সম্ভবত *Abutilon striatum* var. *thompsonii*) এর ভেরিগেটেড জাতটি বাড়ি সাজানোর জন্য ইউরোপে ব্যবহৃত হত। এ ভেরিগেটেড উদ্ভিদের সাথে নন-ভেরিগেটেড উদ্ভিদের গ্রাফটিং করার মাধ্যমে সুন্দর ভেরিগেটেড উদ্ভিদ পাওয়া যেত। অর্থাৎ এ ভেরিগেশন ছিল সংক্রামক। এখন এর কারণ জানা গেছে এটা একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ যা সাদা মাছি দিয়ে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এডলফ্ মেয়ার (Adolf Mayer) তামাক গাছের মোজাইক নামক ভাইরাস ঘটিত রোগ নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেন। ঐ রোগের কারণ তখন জানা ছিল না। (Mayer) নানা ধরনের গবেষণা করেও ঐ রোগের কোন জীবাণু আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। তবে তিনি দেখান যে,

১. রোগাক্রান্ত তামাক পাতায় প্রয়োগ করলে, নীরোগ তামাক পাতায়ও মোজাইক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
২. তাপ দিলে রোগ সংক্রমণের ক্ষমতা কমে যায় কিন্তু ৫৫° সে. এর বেশী তাপ দিলে সংক্রমণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী দিমিত্রী আইওয়ানস্কি (Dimitry Iwanowsky) পরীক্ষা করে দেখান যে,

- তামাকের মোজাইক একটি সংক্রামক রোগ।
- চেম্বারল্যান্ড পরিস্রাবকের মধ্য দিয়ে রোগাক্রান্ত পাতার রসকে ছেঁকে নিলে যে পরিশ্রুত *রস পাওয়া যায় তার রোগ* সংক্রমণ ক্ষমতা নষ্ট হয় না।

সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তামাক গাছের মোজাইক রোগ ব্যাকটেরিয়া হতে নিঃসৃত কোন বিষাক্ত পদার্থ অথবা ব্যাকটেরিয়া হতে আরও ক্ষুদ্রতর কোন জীবাণু দিয়ে হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাস অণুজীব বিজ্ঞানী বেইজেরিঙ্ক (M. Beijerinck) পরীক্ষা করে দেখান যে, এগার ব্লক (ব্যাকটেরিয়া, এর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে না)-এর উপর মোজাইক রোগে আক্রান্ত তামাক পাতার রস রাখলে নীচে জমা পরিস্রুত *রস সুস্থ তামাক গাছে রোগ সংক্রমণ করতে পারে।*

সুতরাং তিনি উল্লেখ করেন সংক্রমণকারী বস্তু কখনও ব্যাকটেরিয়া নয়। বরং তা পরিস্রাব্য, সংক্রমণকারী ও তরল পদার্থের মত পরিব্যাপ্তশীল মূল উপাদান। তিনি এ সংক্রমণকারী তরল পদার্থের নাম দেন - সংক্রামক সজীব তরল (Contagium vivum fluidum or contagious living fluid)।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে টর্ট (Twort) ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডি. হেরেল (D. Herelle) নামক দুজন ডাক্তার ব্যাকটেরিয়ার "কাঁচ সদৃশ রূপান্তর" লক্ষ্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যাকটেরিয়াগুলি ব্যাকটেরিয়া খাদক ভাইরাস বা ব্যাকটেরিওফাজ (bacteriophage) দিয়ে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্ট্যানলি (Dr. W. M. Stanley) তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV) কেলাসিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এ ভাইরাসকে প্রোটিন গঠিত বলে ধারণা করেন।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় পৃথিবীর অধিকাংশ আবিষ্কারের মত ভাইরাস আবিষ্কারের গৌরবও কোন একজন ব্যক্তি বিশেষকে দেয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে অনেক মনীষীর অনেক দিনের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমানের বহুল পরিচিত ভাইরাস জগৎ।

ভাইরাসের গঠন

বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ভাইরাসের গঠন নিম্নরূপ-

প্রতিটি ভাইরাস প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা–

(i) প্রোটিন আবরণ তথা ক্যাপসিড ও

(ii) নিউক্লিক এসিড

i. ক্যাপসিড (Capsid) ঃ অপেক্ষাকৃত জটিল ভাইরাসে নিউক্লিক এসিডের বাহিরে একে ঘিরে অবস্থিত প্রোটিন আবরণটি হলো ক্যাপসিড। এ প্রোটিন আবরণটি অসংখ্য প্রোটিন অণু দিয়ে গঠিত। ক্যাপসিড আবরণের এক একটি প্রোটিন অণুকে ক্যাপসোমিয়ার (capsomere) বলে। এ ক্যাপসোমিয়ার অণুসমূহ নির্দিষ্ট ভাইরাসে নির্দিষ্ট ধরনের।

কোন কোন প্রাণী ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাহিরে একটি লিপোপ্রোটিনের স্তর থাকে এবং এর একককে পেলপোমিয়ার (pelpomer) বলে। এ ধরনের ভাইরাসকে লাইপোভাইরাস (lipovirus) বলে।

কতগুলি ভাইরাসের ক্যাপসিডের বাইরে প্লাজমা ঝিল্লীর স্তর থাকে। এতে ভাইরাসের অভিক্ষিপ্ত অঙ্গসমূহ সমান দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করে। এ সব ভাইরাসকে মিক্সোভাইরাস (mixovirus) বলে।

ii. নিউক্লিক এসিড (Nucleic-Acid) ঃ প্রতিটি ভাইরাস দেহের কেন্দ্রে অবস্থান করে নিউক্লিক এসিড। নিউক্লিক এসিড ভাইরাসের বংশগতি নির্ধারক পদার্থ। নিউক্লিক এসিড দুধরনের DNA (ডি অক্সি-রাইবো নিউক্লিক এসিড) ও RNA (রাইবো নিউক্লিক এসিড)।

উচ্চতর জীবের কোষে DNA ও RNA একত্রে থাকলেও সাধারণত ভাইরাসে DNA অথবা RNA থাকে। সাধারণত উদ্ভিদ ভাইরাসে RNA (ব্যতিক্রম Cauliflower Mosaic Virus-এ DNA থাকে) এবং প্রাণী ভাইরাসে DNA (ব্যতিক্রম - ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পোলিও ভাইরাসে RNA থাকে) থাকে। নিউক্লিক এসিড ও উহাকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাসকে ভিরিয়ন (virion) বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে বলা হয় নিউক্লিওক্যাপসিড।

চিত্র ২.১ ঃ বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসের গঠন

এখানে T_2 ব্যাকটেরিওফাজের গঠন আলোচনা করা হলো-

T_2 ব্যাকটেরিওফাজ ঃ T_2 নামক ব্যাকটেরিওফাজটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস এবং এটা একটি ব্যাঙাচি আকৃতির ভাইরাস। এর গঠন সম্বন্ধেও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে জানা গেছে। T_2 ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়; যথা- মাথা ও লেজ।

মাথা

মাথাটি ষড়ভূজাকৃতির। এর দৈর্ঘ্য ৯৩ মিলি মাইক্রন এবং প্রস্থ ৬৫ মিলি মাইক্রন। এর অভ্যন্তরে ফাঁপা অংশে একটি দুই সূত্রবিশিষ্ট DNA প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে এবং চারিদিকে প্রোটিন অনু একত্রিত হয়ে আবরণের সৃষ্টি করে।

লেজ

মাথার পরবর্তী লম্বা সরু অংশটিকে লেজ বলে। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মিলি মাইক্রন এবং প্রস্থ প্রায় ২৫ মিলি মাইক্রন। লেজের উপরিভাগকে অর্থাৎ মাথা ও লেজের সংযোগস্থলকে কলার বা গ্রীবা বলে। লেজের প্রোটিন আবরণটি ফাঁপা এবং এর বাইরে সংকোচনশীল প্রোটিন আছে। এতে লাইসোজাইম (lysozyme) নামক পোষক কোষের (host cell) আবরণী বিনষ্টকারী এনজাইম থাকে। লেজের শেষ প্রান্তে ৬টি সূক্ষ্ম স্পর্শকতন্তু বা লেজতন্তুযুক্ত একটি ভিত্তি ফলক (base plate) থাকে। এই ভিত্তি ফলকে কতকগুলি কাঁটা (prongs) বিদ্যমান। স্পর্শকতন্তুর সাহায্যে ভাইরাস পোষকের দেহে অবস্থান করে এবং কাঁটা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে।

চিত্র ২.২ ঃ T_2 ভাইরাসের গঠন

আকৃতি (Shape) ঃ ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন- গোলাকৃতি, দন্ডাকৃতি, সূত্রাকৃতি, ব্যাঙাচি আকৃতি, বহুভূজাকৃতি, পাউরুটি আকৃতি ইত্যাদি।

চিত্র ২.৩ ঃ বিভিন্ন আকৃতির ভাইরাস

আয়তন (Size) ঃ পৃথিবীর অসংখ্য প্রকার ভাইরাসের আয়তনও বিভিন্ন। ভাইরাস সাধারণত ১২ মিলিমাইক্রন হতে ৩০০ মিলিমাইক্রন (যেমন পোলিও ভাইরাস ০.০১২ মাইক্রন, তামাকের মোজাইক ভাইরাস ৩০০ মিলি মাইক্রন) পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিচে কতকগুলি ভাইরাসের আয়তন উল্লেখ করা হলো-

ভাইরাস	আয়তন (মিলি মাইক্রনে)
১। হার্পিস (Herpes simplex)	১০০-১৫০
২। ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	৮০-১২০
৩। গোলআলুর মোজাইক ভাইরাস (Potato mosaic virus)	৪৩০×৯.৮
৪। তামাকের মোজাইক ভাইরাস (Tobacco mosaic virus)	৩০০×১৮
৫। পোলিও ভাইরাস (Polio virus)	১২-২৪

সার সংক্ষেপ

- ভাইরাস এক প্রকার অতি আণুবীক্ষনিক, সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তু; যা কেবলমাত্র উপযুক্ত পোষক কোষে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশেষ দেহে বিশেষ বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- ভাইরাস প্রোটিন আবরণ তথা ক্যাপসিড ও নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত।
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসকে ব্যাকটেরিওফাজ বলে।
- T_2 ব্যাকটেরিওফাজকে প্রধানত দুঅংশে বিভক্ত, যথা : মাথা ও লেজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভাইরাস কোন ধরণের উদ্ভিদ?
ক. অকোষীয় খ. এককোষীয়
গ. দ্বিকোষীয় ঘ. বহুকোষীয়

২। ভাইরাস শব্দটি কোন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক. জার্মান ভাষা খ. ফ্রান্স ভাষা
গ. ল্যাটিন ভাষা ঘ. ইংরেজি ভাষা

৩। ভাইরাস সাধারণত কি কি উপাদান দিয়ে গঠিত?
ক. প্রোটিন খ. নিউক্লিক এসিড
গ. ক্যাপসিড ঘ. প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড

পাঠ- ২ ঃ ভাইরাস আয়তন আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ভাইরাসের আয়তন ও আকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাসের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ করতে সক্ষম হবেন।

প্রকৃতি (Nature)

উনবিংশ শতাব্দির ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত ভাইরাসের গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না। পরবর্তীতে আলট্রাসেন্ট্রিফিউগেশন (ultracentrifugation) পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিওফাজ পৃথক করা যায় এবং ভাইরাস সম্পর্কে অধিক জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসের প্রকৃতি জীবনের প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র। জীবজগতের প্রান্তসীমায় অবস্থিত এ ভাইরাস শুধু যে তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকৃতির জন্যই স্বতন্ত্র তা নয় বরং এরা আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে- ভাইরাসকে পানিতে মেশানো যায় (suspension), ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণে ব্যবহৃত ছাঁকনির সাহায্যে ভাইরাস পৃথক সম্ভব নয়, সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের মাধ্যমে পৃথক করা যায় আবার রাসায়নিক পদার্থের মত কেলাসিত করা যায়। এ কেলাসিত ও বিশুদ্ধ প্রায় (para crystal) ভাইরাসকে সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের মতই কাঁচের বোতলে দীর্ঘ দিন রাখা সম্ভব। এভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় ভাইরাসের প্রাণের কোন লক্ষণই থাকে না।

কোনও কোনও ভাইরাসের উপাদানসমূহ পৃথক করে আবার সংযোজন সম্ভব হয়েছে।

উপযুক্ত পোষক দেহে প্রবেশ করালে ভাইরাস অতি দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে, যা কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই সম্ভব। তবে পোষক কোষের বাইরে ভাইরাস সাধারণত রাসায়নিক পদার্থের মতই নির্জীব। এসব কারণে অনেক বিজ্ঞানী ভাইরাসকে "জড় ও জীবের মধ্যকার যোগসূত্র" বলে অভিহিত করেছেন। আমরা এখন ভাইরাসের জড় ও জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানব।

ভাইরাসে জীবের বৈশিষ্ট্য

১। এতে DNA বা RNA আছে।
২। জীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
৩। এতে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটতে দেখা যায়।
৪। এতে পরিব্যক্তি (mutation) ঘটতে দেখা যায়।

ভাইরাসে জড়ের বৈশিষ্ট্য

১। ভাইরাস কোন নির্দিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত নয়।
২। এদের কোন জৈবিক কার্যকলাপ অন্য সজীব কোষ ছাড়া ঘটতে পারে না।
৩। এদের সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, কোষীয় ক্ষুদ্রাঙ্গ এবং বিপাকীয় এনজাইম নেই।
৪। এদেরকে ক্রিস্ট্যালে বা স্ফটিক দানায় রূপান্তরিত করা যায় এবং উক্ত ক্রিস্ট্যাল দানা বহুদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

ভাইরাসের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভাইরাসকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

(ক) পোষক জীব অনুসারে ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারের হতে পারে। যথা–

১। উদ্ভিদ ভাইরাসঃ যে সব ভাইরাস সাধারণত উদ্ভিদ দেহে বংশবৃদ্ধি করে এবং সেখানে রোগ উৎপাদন করে তাদেরকে উদ্ভিদ ভাইরাস বলে। যেমন- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV)।
২। প্রাণী ভাইরাসঃ যে সব ভাইরাস সাধারণত প্রাণী দেহে বংশবৃদ্ধি করে এবং সেখানে রোগ উৎপাদন করে তাদেরকে প্রাণী ভাইরাস বলে। যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।
৩। ব্যাকটেরিওফায্ বা ব্যাকটেরিয়ার ভাইরাস ঃ যে সব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে তাদেরকে ব্যাকটেরিওফায্ বলে। যেমন- T_2 ব্যাকটেরিওফায্।

৪। সায়ানোফায্ ঃ যে সব ভাইরাস সায়ানোব্যাকটেরিয়া তথা নীলাভ সবুজ শৈবালকে আক্রমণ করে তাদেরকে সায়ানোফায্ বলে।

৫। মাইকোফায্ ঃ যে সব ভাইরাস ছত্রাককে আক্রমণ করে তাদেরকে মাইকোফায্ বলে।

৬। এ্যাকটিনোফায্ ঃ যে সব ভাইরাস এ্যাকটিনোমাইসিটিসকে আক্রমণ করে তাদেরকে এ্যাকটিনোফায্ বলে।

(খ) নিউক্লিক এসিডের ধরণ অনুসারে ভাইরাস দুপ্রকারের হতে পারে। যথা–

১। DNA **ভাইরাস ঃ** যে সব ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড DNA (ডি-অক্সিরাইবো - নিউক্লিক এসিড) প্রকৃতির, তারা DNA ভাইরাস নামে পরিচিত। যেমন- T_2 ভাইরাস ও ভ্যাক্সিনিয়া (গো-বসন্ত) ভাইরাস। সাধারণত প্রাণী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিওফায্সমূহ DNA ভাইরাস।

২। RNA **ভাইরাস ঃ** যে সব ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড RNA (রাইরো- নিউক্লিক এসিড) প্রকৃতির, তারা RNA ভাইরাস নামে পরিচিত। যেমন- টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), টিপুলা ইরিডিসেন্ট ভাইরাস (TIV) ইত্যাদি। সাধারণত উদ্ভিদ ভাইরাসসমূহ RNA ভাইরাস।

(গ) পোষক দেহে আক্রান্ত টিস্যু বা কলা ভিত্তিক ভাইরাস নিম্নলিখিত প্রকারে হতে পারে। যথা–

১। ডারমাট্রপিক ঃ এ সব ভাইরাস চর্ম বা ত্বক আক্রমণ করে। যেমন- হাম, বসন্ত, হার্পিস ইত্যাদি ভাইরাস।

২। নিউরোট্রপিক ঃ এ সব ভাইরাস স্নায়ু আক্রমণ করে। যেমন- এনসেফালাইটিস ভাইরাস।

৩। ডিসেরোট্রপিক ঃ এ সব ভাইরাস দেহাভ্যন্তরের কোষ আক্রমণ করে। যেমন- পীতজ্বর ও হেপাটাইটিস ভাইরাস।

৪। প্যান্ট্রপিকঃ এ সব ভাইরাস একাধিক টিস্যু বা কলা আক্রমণ করে। যেমন- **ডেংগুভাইরাস**।

৫। বিবিধ ঃ আরও অন্যান্য ধরনের ভাইরাস রয়েছে। যেমন- মাম্পস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দিজ্বর ইত্যাদি ভাইরাস।

সারসংক্ষেপ

- ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেকে ভাইরাসকে "জড় ও জীবনের মধ্যকার যোগসূত্র" বলে অভিহিত করেন।
- ভাইরাসকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা-
  - পোষক জীব অনুসারে।
  - নিউক্লিক এসিডের ধরণ অনুসারে।
  - পোষক দেহে আক্রান্ত টিস্যু বা কলা ভিত্তিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। উদ্ভিদ ভাইরাসে সাধারণত কোন ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে ?

ক. DNA　　খ. RNA

গ. DNA ও RNA　　ঘ. DNA বা RNA

২। নিউক্লিক এসিডের উপর ভিত্তি করে ভাইরাস কত প্রকার?

ক. দুই　　খ. তিন

গ. এক　　ঘ. চার

৩। টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের আয়তন কত?

ক. ২০০×১৫ মিলিমাইক্রন　　খ. ৩০০×১৫ মিলিমাইক্রন

গ. ২৫০×১৮ মিলিমাইক্রন　　ঘ. ৩০০×১৮ মিলিমাইক্রন

৪। প্রাণী ভাইরাসে সাধারণত কোন ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে?

ক. RNA　　খ. DNA ও RNA

গ. DNA　　ঘ. DNA বা RNA

পাঠ- ৩ ঃ ভাইরাস ঃ সংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাসের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি

Replication of Viruses

ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং গঠন প্রকৃতির দিক থেকে এতে জড় ও জীবের উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংখ্যাবৃদ্ধি বা জননের ক্ষমতা ভাইরাসেও বিদ্যমান। যেহেতু শুধুমাত্র পরজীবী অবস্থাতে পোষক দেহের অভ্যন্তরেই ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে থাকে সেহেতু এদের বংশবৃদ্ধির সঠিক প্রক্রিয়া অনুধাবন করা অত্যন্ত কঠিন। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় T_2 নামক ব্যাকটেরিওফায্টির সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারই আলোকে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) পোষক কোষকে বিদ্ধকরণ বা সংক্রমণ
(২) ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের প্রতিরূপ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক সংশ্লেষণ
(৩) ভাইরাসের উপাদানগুলির সংশ্লেষণ
(৪) ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণার সৃষ্টি এবং
(৫) পোষক-কোষ থেকে পরিণত ভাইরাসের নিষ্ক্রমণ বা লাইসিস।

(১) পোষক কোষকে বিদ্ধকরণ বা সংক্রমণ

ভাইরাস এর লেজ ও স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে পোষক ব্যাকটেরিয়ার (*Escherichia coli*) কোষ প্রাচীরে আটকে যায়। ভাইরাসটির লেজের মাথা যে স্থানে ব্যাকটেরিয়া কোষপ্রাচীর স্পর্শ করে সে স্থানে কিছু উৎসেচকের (enzymes) আবির্ভাব হয় এবং এর ফলে কোষপ্রাচীরে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ভাইরাস নিউক্লিক এসিড (DNA) পোষক কোষে প্রবেশ করে এবং ভাইরাসের ক্যাপসিড বা প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরেই থেকে যায়।

(২) ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের প্রতিরূপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকের সংশ্লেষণ

পোষক কোষের (ব্যাকটেরিয়ার) সাইটোপ্লাজমে ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎসেচকের আবির্ভাবের ফলে পোষক কোষের ক্রোমোজোম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন ভাইরাসের নিউক্লিক এসিড পোষক কোষের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

চিত্র ২.৪ ঃ T_2 ব্যাকটেরিওফাজের সংখ্যাবৃদ্ধি

(৩) ভাইরাসের উপাদানগুলির সংশ্লেষণ

এ পর্যায়টিকে ভাইরাস উপাদানগুলির প্রতিলিপি গঠন পর্যায় হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। এক্ষেত্রে ভাইরাসের নিউক্লিক এসিডের নির্দেশক্রমে পৃথক পৃথকভাবে একদিকে নিউক্লিক এসিডের প্রতিলিপি অপর দিকে প্রোটিন আবরণ তৈরী হতে থাকে।

(৪) ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কণা সৃষ্টি

ভাইরাস উপাদানগুলির প্রতিলিপি গঠন সমাপ্ত হবার সাথে সাথে এ পর্যায়ে ভাইরাস উপাদানগুলির একত্রীকরণ শুরু হয়। নিউক্লিক এসিডের এক একটি প্রতিলিপি এক একটি প্রোটিন আবরণ দিয়ে আবৃত হয় এবং উভয়ের ফলে এক একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস কনার সৃষ্টি হয়।

(৫) পোষক-কোষ থেকে পরিণত ভাইরাসের নিষ্ক্রমণ বা লাইসিস

নতুন সৃষ্ট অপত্য ভাইরাসগুলি প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধানে পরিণতি লাভ করে। পরিণত ভাইরাসের সংখ্যাধিক্যের কারণে পোষক কোষের প্রাচীর বিগলিত বা বিদীর্ণ হয়। ফলে ভাইরাসগুলি পোষক কোষ থেকে মুক্ত হয়। এটাকে লাইসিস পর্যায় বলে।

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Economic importance of viruses

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহে ভাইরাস নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে থাকে। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব বা অকালমৃত্যুও হতে পারে। তবে ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর অনেক উপকার করে থাকে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভাইরাস মানুষের যতনা উপকার করে থাকে তা অপেক্ষা অধিক অপকার করে থাকে। নিচে ভাইরাসের উপকারীতা ও অপকারীতা উল্লেখ করা হলো–

ভাইরাসের অপকারিতা

ভাইরাস উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যথা–

১। মানুষের রোগ ঃ ভাইরাস মানুষের বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতংক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ভাইরাস হেপাটাইটিস প্রভৃতি মারাত্বক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২। মানুষের অন্যান্য রোগ ঃ মানুষের সর্বাপেক্ষা আতংক সৃষ্টিকারী বহুল আলোচিত এইডস্ (AIDS=Acquired Immune Deficiency Syndrome) এর জন্য ভাইরাসই দায়ী। HIV (Human Immuno deficiency Virus) দিয়ে এইডস্ হয়ে থাকে। HIV দিয়ে আক্রান্ত রোগীর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোপ পায়। ফলে মৃত্যু অবধারিত হয়।

৩। গৃহপালিত পশুর রোগ ঃ গরুর বসন্ত; গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর "ফুট এ্যান্ড মাউথ" রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এছাড়া কুকুর ও বিড়ালের জলাতঙ্ক রোগ ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে।

৪। উদ্ভিদের রোগ ঃ বিভিন্ন উদ্ভিদের মোজাইক রোগ, লিফরোল (পাতা কুচকানো রোগ), বুশিষ্ট্যান্ট, ধানের টুংগ্রো রোগ ইত্যাদি প্রায় ৩০০ ধরনের রোগ ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে।

৫। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস ঃ মানুষের উপকারী কিছু ব্যাকটেরিয়াকে ভাইরাস ধ্বংস করে।

৬। ইবোলা ভাইরাস ঃ ১৯৭৬ এবং ১৯৭৯ সালে এই ভাইরাস সৃষ্ট মহামারীতে জায়ারে এবং সুদানে শত শত লোক মারা যায়। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগ।

নিচে কয়েকটি ভাইরাস রোগের নাম, পোষক দেহ এবং সংশ্লিষ্ট ভাইরাসের নাম দেওয়া হলো–

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাস
এইডস্ (লক্ষণ সমষ্টি)	মানুষ	HIV
?	মানুষ	ইবোলা
বসন্ত	মানুষ	ভেরিওলা
হাম	মানুষ	রুবিওলা
জার্মানী হাম	মানুষ	রুবেলা
পোলিওমাইলাইটিস	মানুষ	পোলিও ভাইরাস

রোগের নাম	পোষক দেহ	ভাইরাস
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস
হার্পিস	মানুষ	হার্পিস সিমপ্লেক্স
ভাইরাল হেপাটাইটিস	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি-ভাইরাস
গোবসন্ত	গরু	ভ্যাক্সিনিয়া
ফুট এন্ড মাউথ	গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর	ফুট এন্ড মাউথ ভাইরাস
মোজাইক	তামাক	তামাকের মোজাইক ভাইরাস (TMV)
বুশিষ্টান্ট	টমেটো	টমেটো বুশিষ্ট্যান্ট ভাইরাস
পীত	শালগম	টারনিপ ইয়োলো ভাইরাস
মোজাইক	শিম, শসা ইত্যাদি	মোজাইক ভাইরাস
টুংগ্রো	ধান	টুংগ্রো ভাইরাস

ভাইরাসের উপকারিতা

বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যথা-

(১) প্রতিষেধক প্রস্তুত ঃ বসন্ত, পোলিও, জন্ডিস এবং জলাতংক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরী করা হয়।

(২) জীনতত্ত্ব ও আনবিক জীববিদ্যার গবেষণা ঃ ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত জীনতত্ত্ব ও আনবিক জীববিদ্যা বা জেনেটিক প্রোকৌশলে-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৩) রোগ প্রতিরোধ ঃ ফায্ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়া জনিত আমাশয় রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

(৪) পোকামাকড় দমন ঃ অধুনা প্রযুক্তির হাতিয়ার রূপে কতিপয় ভাইরাস ব্যবহার করে কতিপয় ক্ষতিকর পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমন সম্ভব হয়েছে।

(৫) বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ ঃ জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া, অভিব্যক্তি ও ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার চাবিকাঠি হলো ভাইরাস, কেননা ভাইরাসে জীব ও জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

সারসংক্ষেপ

- জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সংখ্যাবৃদ্ধি বা জননের ক্ষমতা ভাইরাসেও বিদ্যমান। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।
- ভাইরাস মানুষসহ অন্যান্য জীবের উপকার ও অপকার দুটাই করে থাকে। তবে ভাইরাস মানুষের উপকারের তুলনায় অপকার বেশি করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
ক. ছয়টি খ. পাঁচটি
গ. সাতটি ঘ. চারটি

২। মানুষের AIDS এর জন্য কোন ভাইরাস দায়ী?
ক. HIV খ. ইবোলা
গ. ভেরিওলা ঘ. রুবিভলা

৩। ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হার কত?
ক. শতকরা ৭০ ভাগ খ. শতকরা ৮০ ভাগ
গ. শতকরা ৯০ ভাগ ঘ. শতকরা ৯৫ ভাগ

৪। ভাইরাস দিয়ে ধানের কত ধরনের রোগ হতে পারে?
ক. ১৫০ ধরনের খ. ২০০ ধরনের
গ. ২৫০ ধরনের ঘ. ৩০০ ধরনের

পাঠ- ৪ ঃ ব্যাকটেরিয়া ঃ আবিষ্কার, নামকরণ শ্রেণীবিভাগ

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ব্যাকটেরিয়া কি তা বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়া কি?

ব্যাকটেরিয়া হলো সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন, প্রাককেন্দ্রিক (যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়) এককোষী আণুবীক্ষণিক (যাদেরকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না) জীব। গাঠনিক উপাদান ও পুষ্টি পদ্ধতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয়।

ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার

পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব বহু পূর্ব হতে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র না থাকার কারণে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু জানা যায়নি। তবে ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে ব্যাকটেরিয়োলজী ও প্লোটো-জুয়োলজীর জনক বলে পরিচিত অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক (Antony Van Leeuwenhock)-এর ডায়েরী ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কারের প্রথম দিনগুলির সাক্ষ্য বহন করে। হলান্ডের ডেট (Delft) শহর নিবাসী বিজ্ঞানী লিউয়েনহুক ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁর ডায়েরীতে যে বিবরণ লিখেছেন তাতে জানা যায় ঐ মাসের ৯ তারিখে তিনি একটি পাত্রে কিছু বৃষ্টির পানি ধরেছিলেন। ১০ তারিখে তিনি তাঁর স্বহস্তে নির্মিত সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে উক্ত পানিতে কিছু জীবন্ত বস্তু আছে বলে মনে করেন। কিন্তু সেগুলো এত ছোট ও সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে তিনি এটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি। পরে ১১ই জুন তারিখে পুনরায় ঐ পানি নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র আকৃতির জীব দেখতে পান। তিনি এগুলোর নাম দেন ক্ষুদ্রপ্রাণী বা Animacules। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে লন্ডনের রয়াল সোসাইটিকে লেখা লিউয়েন হুকের চিঠিতে ব্যাকটেরিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর রবার্ট হুক (Robert Hooke) এবং নিয়ামী গ্র (Nehemiah Grew) মরিচ ভিজানো পানি পরীক্ষা করে লিউয়েন হুকের আবিষ্কার প্রমাণ ও সমর্থন করেন।

ব্যাকটেরিয়া নামের ব্যবহার

ব্যাকটেরিয়াম (Bacterium) শব্দটি গ্রীক ভাষা হতে উৎপত্তি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Ehrenberg সর্ব প্রথম ব্যাকটেরিয়াম শব্দটি ব্যবহার করেন। ব্যাকটেরিয়াম (bacterium) শব্দের অর্থ দন্ড (staff)। ব্যাকটেরিয়াম শব্দের বহুবচন ব্যাকটেরিয়া (bacteria)। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (Louis Pasteur) এবং জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক (Robert Kock) প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় স্বল্পজ্ঞাত অণুজীব বিজ্ঞান আধুনিক অণুজীব বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণী বিভাগ

বিভিন্ন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেমন কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির ভিন্নতা, ফ্রাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহণের ক্ষমতা, স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) কোষের আকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস

আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে চার প্রকারে বিভক্ত করা হয়। যথা-

১। কক্কাস (Coccus) [বহুবচনে কক্কাই, pl. cocci] ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি প্রায় গোলাকার তাদেরকে কক্কাস বলে। কক্কাস ব্যাকটেরিয়াকে আবার নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয় ঃ

i) **মাইক্রোকক্কাস** (Micrococcus) ঃ এগুলি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া এবং এককভাবে অবস্থান করে। উদাহরণ *Micrococcus denitrificans*।

ii) **ডিপ্লোকক্কাস** (Diplococcus) ঃ গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া, দুটি দুটি করে এক এক দলে অবস্থান করে। উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae*

iii) **টেট্রাড** (Tetrad) ঃ এক্ষেত্রে গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া চারটি করে এক এক দলে অবস্থান করে। উদাহরণ *Guffkya tetragena*

iv) **স্ট্যাফাইলো কক্কাস** (Staphylococcus) ঃ এক্ষেত্রে গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া অনেকগুলি একত্রে অনিয়মিত দলে অবস্থান করে এবং দলগুলি দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের গোছার মত মনে হয়। উদাহরণ *Staphylococcus aureus*

v) **স্ট্রেপটোকক্কাস** (Streptococcus) ঃ এক্ষেত্রে গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া পাশাপাশি অবস্থান করে একটি মালা বা তস্‌বীহ্‌র মত তৈরি করে। উদাহরণ- *Streptococcus lactis*

vi) **সারসিনা** (Sarcina) ঃ এক্ষেত্রে গোলাকৃতির ব্যাকটেরিয়া একত্রে সমান সমান দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঘন তলের মত গঠন করে। উদাহরণ *Sarcina aurantiaca.*

চিত্র ২.৫ ঃ বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া
ক) মাইক্রোকক্কাস, (খ) ডিপ্লোকক্কাস, (গ) স্ট্রেপটোকক্কাস
(ঘ) স্ট্যাফাইলো কক্কাস এবং (ঙ) সারসিনা

২। ব্যাসিলাস (Bacillus) বহুবচনে ব্যাসিলি pl. Bacilli] ঃ বেলুনাকার বা দন্ডাকৃতির কোষ বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে ব্যাসিলাস বলে। উদাহরণ *Bacillus subtilis, B. ulbus, B. aureus, B. licheniformis, B. anthracis* ইত্যাদি।

৩। স্পাইরিলাম (Spirillum) [বহুবচনে স্পাইরিলা, pl. spirilla] ঃ সর্পিলাকারে কুন্ডলিত বা প্যাঁচানো আকৃতির কোষ বিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে।

উদাহরণ- *Spirillum volutans, S. minus,*
T. reponema pallidum ইত াদি।

৪। ভাইব্রিও বা কমা (Comma) ঃ সামান্য বাঁকা বা কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে কমা বলে।
উদাহরণ - *Vibrio cholerae*।

চিত্র ২.৬ ঃ বিভিন্ন আকৃতির ব্যাকটেরিয়া ঃ (ক) ব্যাসিলাস খ) কমা
গ) স্পাইরিলাম এবং ঘ) স্পাইরোকিটি

খ) অক্সিজেন নির্ভরশীলতা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ ঃ অক্সিজেন এর নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণত পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

১। বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Aerobic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতি ছাড়া বাঁচতে পারে না। উদাহরণ *Bacillus subtilis।*

২। অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Anaerobic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না অর্থাৎ এরা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বাঁচতে পারে। উদাহরণ - *Clostridium tetani*।

৩। সুবিধাবাদী বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Facultative aerobic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভালভাবে বেঁচে থাকে, তবে, অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে মরে যায় না।

৪। সুবিধাবাদী অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Facultative anaerobic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া সাধারণত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভালভাবে বেঁচে থাকে, তবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও জন্মাতে পারে।

৫। অণুবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া (Micro-aerophilic) ঃ এসব ব্যাকটেরিয়া সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারে, তবে, অধিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে মারা যায়।

(গ) তাপমাত্রা সহনশীলতা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়াকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। উষ্ণ তাপ সহ্যকারী ব্যাকটেরিয়া (Thermophilic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বর্ধনের (optimal growth) জন্য ৪৫-৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন।

২। মধ্যম তাপ সহ্যকারী ব্যাকটেরিয়া (Mesophilic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়ার পরিমিত বর্ধন হয় ৩০-৪৫ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রায়।

৩। নিু তাপ সহ্যকারী ব্যাকটেরিয়া (Psychrophilic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়ার পরিমিত বর্ধনের জন্য প্রয়োজন ০-৫ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা। তবে এ ধরনের কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও জন্মাতে পারে।

(ঘ) পুষ্টি ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

পুষ্টি সাধন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে প্রধাণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়-

১। স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া (Autotrophic bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়া নিজেদের খাদ্য নিজেরা প্রস্তুত করতে সক্ষম তাদেরকে স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া বলে।

স্বভোজী ব্যাকটেরিয়াকে দুভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

i) ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া (Photosynthetic bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া খাদ্য তৈরীর জন্য আলোক শক্তি ব্যবহার করে। এ সব ব্যাকটেরিয়ার কোষে ব্যাকটেরিয়োক্লোরোফিল (bacteriochlorophyll) আছে যা অন্যান্য উদ্ভিদের ক্লোরোফিল থেকে ভিন্ন।

ii) কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া (Chemosynthetic bacteria) ঃ এ সব স্বভোজী ব্যাকটেরিয়া খাদ্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য জারণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে।

২। পরজীবী ব্যাকটেরিয়া (Parasitic bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়া জীবিত উদ্ভিদ বা জীবিত প্রাণীদেহে বাস করে এবং ঐ সমস্ত দেহ হতে পুষ্টিদ্রব্য সংগ্রহ করে তাদেরকে পরজীবী বা প্যারাসাইটিক ব্যাকটেরিয়া বলে।

৩। মৃতজীবী ব্যাকটেরিয়া (Saprophytic bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়া মৃত উদ্ভিদ, মৃত প্রাণী অথবা অন্য কোন জৈবিক পদার্থ হতে পুষ্টিদ্রব্য সংগ্রহ করে তাদেরকে মৃতজীবী বা স্যাপ্রোফাইটিক ব্যাকটেরিয়া বলে।

(ঙ) রঞ্জন বিক্রিয়া ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

এ পদ্ধতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে দুভাবে ভাগ করা যায়। যথা–

১। গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram positive bacteria) ঃ গ্রাম পদ্ধতির আবিষ্কারক ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম (ঈযৎরংঃরধহ এৎধস) দেখিয়েছিলেন, যে সব ব্যাকটেরিয়াকে কৃস্ট্যাল ভায়োলেট ও আয়োডিন সহযোগে রং করে পরে স্পিরিটে ধুয়ে ফেললে কৃষ্ট্যাল ভায়োলেটের রং ধরে রাখে তাদেরকে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Staphylococcus, Streptococcus* ইত্যাদি।

২। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া (Gram negetive bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়াকে কৃষ্ট্যাল ভায়োলেট এবং আয়োডিন সহযোগে রং করে, পরে স্পিরিটে ধুয়ে ফেললে কৃষ্ট্যাল ভায়োলেটের রং হারিয়ে ফেলে এবং পরে মারকিউরোক্রোম, স্যাফরানিন বা কার্বন ফুকসিন দিয়ে রং করলে লাল রং ধারণ করে তাদেরকে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বলে উদাহরণ *Gonococcus, Pseudomonas* ইত্যাদি।

(চ) স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

স্পোর উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়-

১। স্পোর উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া (Spore forming bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া স্পোর উৎপাদন করতে পারে। উদাহরণ- *Bacillus.*

২। স্পোর অনুৎপাদক ব্যাকটেরিয়া (Spore nonforming bacteria) ঃ এ সব ব্যাকটেরিয়া স্পোর উৎপাদন করতে পারে না। উদাহরণ - *Coccus.*

(ছ) ফ্লাজেলা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

ব্যাকটেরিয়া কোষে ফ্লাজেলার উপস্থিতি অনুপস্থিতি, সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। এ্যট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া (Atrichous bactria) ঃ ব্যাকটেরিয়াতে কোনও ফ্লাজেলা না থাকলে তাকে এ্যট্রাইকাস বলে। সাধারণত কক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এরকম হয়। উদাহরণ- *Micrococcus*

২। মনোট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া (Monotrichous bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়ার এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্লাজেলাম থাকে, তাদেরকে মনোট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Pseudomonas*

৩। এ্যামফিট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া (Amphitrichous bactria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়ার দুপ্রান্তে ফ্লাজেলা সংযুক্ত থাকে তাদেরকে এ্যামফিট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Chromobacterium violaceum, Spirillum serpantans* ইত্যাদি।

৪। লফোট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া (Lophotrichous bacteria) ঃ যে সব ব্যাকটেরিয়ার এক প্রান্তে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা থাকে, তাদেরকে লফোট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Pseudomonas*

৫। পেরিট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া (Peritrichous bacteria) ঃ ব্যাকটেরিয়া কোষের চার পাশে ফ্লাজেলা থাকলে তাদেরকে পেরিট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়া বলে। উদাহরণ- *Salmonella typhosa*

চিত্র ২.৭ ঃ ব্যাকটেরিয়া কোষে ফ্লাজেলার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি ক) এ্যাট্রাইকাস খ) মনোট্রাইকাস গ) লফোট্রাইকাস ঘ) এ্যামফিট্রাইকাস ঙ) পেরিট্রাইকাস

সারসংক্ষেপ

- ব্যাকটেরিয়া হলো সাধারণত ক্লোরোফিলবিহীন প্রাককেন্দ্রিক, এককোষী আণুবীক্ষণিক জীব।
- অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক-কে ব্যাকটেরিয়োলজীর জনক বলা হয়।
- ব্যাকটেরিয়া শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন এরেনবার্গ।
- ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতিগত পার্থক্য, জৈবিক প্রক্রিয়া, পুষ্টির ভিন্নতা, ফ্লাজেলার বিভিন্নতা, রঞ্জন গ্রহনের ক্ষমতা, স্পোর উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ব্যাকটোরিওলজীর জনক কাকে বলা হয়?
- ক. লুই পাস্তুর
- খ. অ্যান্টনি ভন লিউয়েন হুক
- গ. ওয়াকস্ম্যান
- ঘ. স্প্যালাঞ্জানী

২। ব্যাকটেরিয়া শব্দের অর্থ?
- ক. গোলাকৃতি
- খ. প্যাঁচানো আকৃতি
- গ. দন্ড
- ঘ. কমা আকৃতি

৩। রঞ্জন ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ব্যাকটেরিয়া কত প্রকার?
- ক. দুই
- খ. তিন
- গ. চার
- ঘ. পাঁচ

৪। আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ব্যাকটেরিয়া কত প্রকার?
- ক. দুই
- খ. তিন
- গ. পাঁচ
- ঘ. চার

৫। মেসোফিলিক ব্যাকটেরিয়ার উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
- ক. ৩০-৪৫ ডিগ্রী সে.
- খ. ২৪-৩০ ডিগ্রী সে.
- গ. ২০-৩০ ডিগ্রী সে.
- ঘ. ৩০-৫০ ডিগ্রী সে.

৬। এ্যাট্রাইকাস ব্যাকটেরিয়াতে কয়টি ফ্লাজেলাম থাকে?
- ক. দুই
- খ. শূন্য
- গ. তিন
- ঘ. চার

পাঠ- ৫ ঃ ব্যাকটেরিয়া ঃ গঠন ও প্রজনন

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ব্যাকটেরিয়ার গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন

বিভিন্ন জাতীয় ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন বিভিন্ন প্রকার। এখানে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন বর্ণনা করা হল।

১। ফ্লাজেলা ঃ ব্যাকটেরিয়া কোষের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে এক ধরনের প্রোটোপ্লাজম গঠিত সূত্রাকৃতির উপাঙ্গ কোষপ্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একে ফ্লাজেলাম (বহুবচনে ফ্লাজেলা) বলে। ফ্লাজেলার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া তরল মাধ্যমে চলাফেরা করে। ফ্লাজেলা অপেক্ষা খাট ও শক্ত উপাঙ্গকে ফিমব্রী বলে। ব্যাকটেরিয়াকে কোন কিছুর সাথে আটকে থাকতে ফিমব্রী সহায়তা করে।

২। ক্যাপসুল ঃ ক্যাপসুল, পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি স্তর, যা ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরের দিকে থাকে। এ স্তরকে পাইম স্তরও বলা হয়। কোন কোন সময় ক্যাপসুল অত্যন্ত পুরু আবরণের সৃষ্টি করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিকূল অবস্থা হতে রক্ষা করে। তবে সব ব্যাকটেরিয়ায় এ স্তরটি থাকে না।

৩। কোষপ্রাচীর ঃ ক্যাপসুলের নীচে কোষপ্রাচীর অবস্থিত। এটা প্রোটিন, লিপিড ও পরিস্যাকারাইড দিয়ে গঠিত। কোষপ্রাচীর সাধারণত ১০-২৫ mμ (মিলিমাইক্রন) পুরু হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া কোষের শতকরা ১০-৪০ ভাগ ওজন তার প্রাচীরের, এটা ব্যাকটেরিয়া কোষের নির্দিষ্ট আকার ও দৃঢ়তা দান করে। কোষপ্রাচীরে প্রায় ১ mμ ব্যাসবিশিষ্ট অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র আছে। এ সমস্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক পদার্থসমূহ চলাচল করে।

৪। সাইন্টোপ্লাজমিক মেমব্রেন ঃ কোষ প্রাচীরের নীচে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন অবস্থিত। এটা প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে গঠিত এবং কোষ-প্রাচীর হতে ভিন্ন। এ স্তরে অনেক এনজাইম আছে। কোন কোন ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন স্ত রটিতে পকেটের মত খাঁজ দেখা যায়। একে মেসোজোম বলে।

৫। সাইটোপ্লাজম ঃ সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। এটি সাধারণত বর্ণহীন। এতে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন ইত্যাদি উপস্থিতির ফলে সাইটোপ্লাজম দানাদার বলে মনে হয়। ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায়, সেগুলি হল–

চিত্র ২.৮ ঃ একটি সার্বিক ব্যাকটেরিয়া কোষ (আংশিক ছেদিত দৃশ্য)

ক) রাইবোজোম ঃ সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকার যে সমস্ত ফাঁপা পদার্থ দেখা যায় সেগুলি রাইবোজোম নামে পরিচিত। প্রতিটি রাইবোজোম RNA ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত। প্রোটিন সংশ্লেষণই এর প্রধান কাজ।

খ) ক্রোম্যাটোফোর ঃ কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে সবুজ ও লালচে ধূসর বর্ণের রঞ্জক পদার্থ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এসব রঞ্জক পদার্থ ব্যাকটেরিয়ার সালোকসংশ্লেষণে সাহায্য করে। এটি শুধুমাত্র সালোকসংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া সমূহে দেখা যায়।

গ) গহ্বর ঃ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখা যায়। গহ্বরগুলি কোষরস দিয়ে পূর্ণ থাকে।

ঘ) ভলিউটিন ঃ তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার আকারে ভলিউটিন থাকে। পুরোনো কোষে এসব ভলিউটিন দানা কোষ গহ্বরে স্থানান্তরিত হয়।

৬। নিউক্লিয়াস ঃ ব্যাকটেরিয়ার কোষে কোন সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস ব্যাকটেরিয়াতে অনুপস্থিত তবে কোষের প্রায় কেন্দ্রস্থলে নিউক্লিওয়েড অবস্থিত। একটি দুই সূত্র বিশিষ্ট DNA দিয়ে নিউক্লিওয়েড গঠিত। নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসের অনুপস্থিতির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে প্লো-ক্যারিওটিক (প্রাককেন্দ্রিক) জীব বলা হয়।

কতিপয় ব্যাকটেরিয়াতে (যেমন- *E. coli*) নিউক্লিওয়েড ছাড়াও অতিরিক্ত ছোট বৃত্তাকার DNA থাকে; একে প্লাজমিড (plasmid) বলে। প্লাজমিডযুক্ত ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক প্রকৌশলে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন

ব্যাকটেরিয়া সাধারণত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় (binary fission) বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এটি একটি অযৌন প্রকৃতির জনন। তবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার স্পোর উৎপাদন হয় না বলে এ প্রক্রিয়াকে অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction) ও বলা হয়। নিচে ব্যাকটেরিয়ার জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১। দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া বা বাইনারী ফিশন (Binary fission) ঃ দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়াই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক ও প্রধান উপায়। এটি অত্যন্ত সরল ও দ্রুততম জনন প্রক্রিয়া। আপাত দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত সহজ প্রক্রিয়া মনে হলেও জীবাণুবিদ Knaysi (১৯৫১) এর মতে এ প্রক্রিয়াটি তিনটি নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে ঘটে-

প্রথমত: ব্যাকটেরিয়া কোষের মাঝামাঝি জায়গায় এর সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন ভিতরের দিকে বাড়তে থাকে এবং কেন্দ্রিকা বস্তুটিও বিভক্ত হতে থাকে এবং এই সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন একত্রিত হয়ে কোষটিকে দ্বিধাবিভক্ত করে। নবগঠিত কোষ দুটির প্রত্যেকে কেন্দ্রিকা বস্তু লাভ করে।

চিত্র ২.৯ ঃ দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি।

দ্বিতীয়ত: নতুন কোষ দুটি পৃথক ভাবে দুটি পূর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ নতুন সৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ কোষ দুটি স্ফীতি চাপের (turgor pressure) ফলে পরস্পর হতে আলাদা হয়ে যায় এবং একটি ব্যাকটেরিয়াম হতে দুটি ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।

অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াতে দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। নতুন সৃষ্ট কোষ দুটি বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে এটি আবার বিভক্ত হতে পারে এবং এ কারণেই ডিপ্লোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এধরনের বিভাজনের জন্য সাধারণত ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হয়।

২। যৌনজনন (Sexual reproduction)

ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জননের হার অত্যন্ত কম। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লেডারবার্গ ও টেটাম (Lederbers and Tetum) নামক গবেষকদ্বয় *Escherichia coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে সর্ব প্রথম যৌন জনন আবিষ্কার করেন। ব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে বংশগত বিষয়ক চরিত্রাবলীর বিনিময় ও পুনর্বিন্যাস ঘটলেও ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

ব্যাকটেরিয়া কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n)। ব্যাকটেরিয়ার এ ধরনের জননের জন্য ভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট দুটি কোষের প্রয়োজন। এদের একটি দাতা কোষ (+) (doner cell) এবং অপরটি গ্রহিতা কোষ (-) (recipient cell) হিসেবে কাজ করে। দাতা কোষ ও গ্রহিতা কোষ দুটি পাশাপাশি চলে আসে এবং এদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন বা কনজুগেশন নালী সৃষ্টি হয়। এ কনজুগেশন নালীর মধ্য দিয়ে দাতা কোষের ক্রোমোজোম গ্রহিতা কোষে প্রবেশ করতে শুরু করে। তবে সাধারণত দাতা কোষের সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম গ্রহিতা কোষে স্থানান্তরিত হবার পূর্বেই কোষ দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে গ্রহিতা কোষ দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোজোম লাভ করে। আংশিক ক্রোমোজোম লাভ করে গ্রহিতা কোষে যে জাইগোট সৃষ্টি হয় তা আংশিক বা অসম্পূর্ণ জাইগোট। এ অসম্পূর্ণ জাইগোটকে মেরোজাইগোট (merozygote) বলে। গ্রহিতা কোষের মেরোজাইগোটে দাতা কোষের (+) ক্রোমোজোম এবং গ্রহিতা কোষের (-) ক্রোমোজোমের মধ্যে রিকম্বিনেশন বা অংশের বিনিময় ঘটে এবং এরা পুনর্বিন্যাসিত হয়। অতিরিক্ত ক্রোমোজোম বিলুপ্ত হয়। এরপর গ্রহিতা কোষটি দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ প্রক্রিয়ায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় ঘটলেও কোন ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না বরং দাতা কোষটি আংশিক ক্রোমোজোম হারিয়ে অচিরেই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

যৌন জনন প্রক্রিয়া ছাড়াও দ্রবণীয় DNA-এর সাহায্যে (যাকে ট্রান্সফর্মেশন প্রক্রিয়া বলে), ভাইরাসের মাধ্যমে (যাকে ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া বলে) ও প্লাজমিড নামক বিশেষ এক প্রকার বস্তুর সাহায্যে ব্যাকটেরিয়াতে চারিত্রিক গুণাবলীর স্থানান্ত র ও পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে।

চিত্র ২.১০ ঃ ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়।

প্রতিকূল অবস্থায় একটি ব্যাকটেরিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট হতে একটি মাত্র স্পোর উৎপন্ন হয়। এ স্পোরের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে এবং অনুকূল পরিবেশে এটা থেকে একটি মাত্র ব্যাকটেরিয়ামের সৃষ্টি হয়।

এছাড়া কোন কোন ব্যাকটেরিয়াতে বাডিং (budding) প্রক্রিয়ায়, কোন কোন ব্যাকটেরিয়াতে শাখা উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, কোন কোন ব্যাকটেরিয়াতে কনিডিয়া (conidia) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আবার কোন কোন ব্যাকটেরিয়াতে গনিডিয়া (gonidia) দিয়ে বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

- কোন কোন ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরে এক ধরনের সূত্রাকৃতির উপাঙ্গ থাকে একে ফ্লাজেলাম (বহুবচনে - ফ্লাজেলা) বলে।
- ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষপ্রাচীর জটিল প্রকৃতির। এদের জটিল কোষ প্রাচীর তিন অংশে বিভক্ত যথা-
- i) ক্যাপসুল ii) কোষপ্রাচীর ও iii) সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন।
- ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম, ক্রোমাটোফোর, গহ্বর, ভলিউটিন, মেসোজোম ইত্যাদি থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়।
- ব্যাকটেরিয়া সাধারণত দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে।
- ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন প্রকৃতির - এক্ষেত্রে বংশগত বিষয়ক চরিত্রাবলীর বিনিময় ও পুনর্বিন্যাস ঘটলেও ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১। যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া কোষে ফ্লাজেলাম থাকে না তাদেরকে কি বলা হয়?
ক. মনোট্রাইকাম খ) লফোট্রাইকাস
গ. অ্যামিফট্রাইকাস ঘ. এ্যাট্রাইকাস

২। ব্যাকটেরিয়া জটিল কোষ প্রাচীর কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক. এক খ. তিন
গ. দুই ঘ. চার

৩। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াসে কোন ধরনের নিউক্লিক এসিড থাকে?
ক. DNA খ. RNA
গ. DNA বা RNA ঘ. DNA ও RNA

৪। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত কোন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে?
ক. যৌন জনন খ. বাডিং
গ. দ্বি-ভাজন ঘ. স্পোর সৃষ্টি

পাঠ- ৬ ঃ ব্যাকটেরিয়া ঃ অর্থনৈতিক গুরুত্ব

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ব্যাকটেরিয়ার উপকারীতা বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়ার অপকারী দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মানব সমাজে ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার-অপকার দুটাই করে থাকে। সাধারণত ওদের ক্ষতিকর কার্যকলাপই আমাদের চোখে ধরা পড়ে বলে আমরা ব্যাকটেরিয়াকে শত্র *বলে মনে করি। কিন্তু* প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া আমাদের অনেক উপকারও করে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক দিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়া আমাদের যে সব লাভ বা ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে তার সবই অর্থকরী গুরুত্ব বলে বিবেচিত। নিচে ব্যাকটেরিয়ার উপকারী ও অপকারী দিকগুলো আলোচনা করা হলো–

(ক) ব্যাকটেরিয়ার উপকারী কার্যাবলী

১। এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরীতে

অধিকাংশ এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ এ্যাকটিনোমাইসিটিস জাতীয় অণুজীব হতে উৎপন্ন হলেও ব্যাকটেরিয়া হতেও কিছু প্রয়োজনীয় এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরী করা হয়। যথা-

ব্যাকটেরিয়া	এ্যান্টিবায়োটিক
Bacillus subtilis	সাবটিলিন
Bacillus polymyxa	পলিমিক্সিন
Bacillus licheniformis	ব্যাসিট্রাসিন ইত্যাদি উল্লেখ্য।

২। প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন তৈরিতে

ভাইরাসের মত ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যেও কতগুলি সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়।

এছাড়া ডিপিটি (DPT; ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধণুষ্টংকার) রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়। *Corynebacterium diptheriae (D) Bordetalla pertutis (p),* এবং *Clostridium tetani* (T) হতে DPT নামকরণ করা হয়েছে।

৩। চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ

চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪। চামড়া শিল্পে

চামড়া হতে লোম ছাড়ানো ও চামড়াকে নমনীয়করণের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

৫। পাটের আঁশ ছাড়ানো

পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হয়। এ পাটের আঁশকে পৃথকীকরণে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাটের আঁশ পৃথকীকরণে পাটকে পানিতে জাগ দেওয়া হয় এবং এক্ষেত্রে আঁশ পৃথক করতে বায়বীয় ও অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে পাটের আঁশ পৃথক করণের বিকল্প পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

৬। ভিটামিন প্রস্তুতিতে

মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী *Escherichia coli (E. coli), Aerobacter aerogenes* এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াগুলি ভিটামিন 'বি', থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, নিকোটিনিক এসিড, প্যান্টোথেনিক এসিড, বায়োটিন, ফলিক এসিড, ভিটামিন-কে ইত্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে।

৭। রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে

উপযুক্ত মাধ্যম, প্রজাতি ও নিয়ন্ত্রিত আবাদের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রবাদি উৎপাদন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে-সিরকা বা ভিনেগার (*Acetobacter xylinum* হতে), ল্যাকটিক এসিড (*Bacillus lacticacidi* হতে), এবং এ্যাসিটোন (*Clostridium acetobutylicum* হতে) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

৮। আবর্জনা পঁচনে
উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এবং নানাবিধ জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার সাধন করে। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে জীবের মৃতদেহের পচন না ঘটলে সমস্ত পৃথিবী মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হত এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ আমাদের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ত। ব্যাকটেরিয়ার এ পচন ক্রিয়ার কারণেই পুঁতিগন্ধময় মৃত জীবদেহ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিদূরিত হয় বলেই ব্যাকটেরিয়াকে প্রাকৃতিক ঝাড়ুদার (Natural scavenger) বলা হয়।

৯। সেলুলোজ হজমে
গবাদি পশু ঘাস, খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্ত্রে অবস্থিত এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ঘাস, খড়ের প্রধান অংশ সেলুলোজ হজম করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

১০। দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতিতে
দুধ থেকে দই, মাখন, পনির প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুতে ব্যাকটেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। এ সব খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ ব্যাকটেরিয়ার গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

১১। পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে
ময়লা, আবর্জনা, মলমূত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশানো নর্দমার পানিকে দূষণমুক্ত এমনকি পুন:ব্যবহার উপযোজী করতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

১২। টেস্টিং সল্ট প্রস্তুতে
টেস্টিং সল্ট প্রস্তুতিতে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করতে এ সল্ট ব্যবহৃত হয়।

১৩। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে
মাটির উর্বরতায় ব্যাকটেরিয়ার অবদান অনেক বেশী। মৃত গাছপালা ও প্রাণীদেহের পচন, বিগলন ও পরিশেষে বিভিন্ন সরল উপাদানে পরিণত করতে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

১৪। নাইট্রোজেন সংবন্ধনে
বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সরাসরি কাজে লাগে না। মাটিতে বসবাসকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন- *Azotobacter, Pseudomonas Clostridium* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া সরাসরি বায়ু হতে নাইট্রোজেন ধরে নাইট্রোজেন যৌগ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে। ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলগুটিকায় (nodule) বসবাসকারী সহবাসী (symbiotic) ব্যাকটেরিয়া (যথা- *Rhizobium* ও *Bacillus* প্রজাতি) বায়ুস্থ গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে নাইট্রেট যৌগে পরিণত করে, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

১৫। জিন প্রকৌশলে ঃ বর্তমানে জীনতাত্ত্বিক গবেষণা ও জীন স্থানান্তর প্রকৌশলে প্রধানত ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৬। ফলন বৃদ্ধিতে
কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন শতকরা ৩১.৮ ভাগ এবং গমের উৎপাদন শতকরা ২০.৮ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

১৭। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে
প্রাকৃতিক গ্যাস তথা মিথেন, বুটেন প্রভৃতি জ্বালানী গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উপযোগী করতে নানাবিধ ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৮। কীট পতঙ্গের বায়োলজিক্যাল নিয়ন্ত্রণে
কোন কোন ব্যাকটেরিয়া লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) ও অন্যান্য পতঙ্গের লার্ভা আক্রমণ করে এবং সেগুলোকে সমূলে বিনষ্ট করে। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন প্রকার পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

১৯। তেল অপসারণে ঃ সমুদ্রের পানিতে ভাসমান তেল অপসারণে তেল খাদক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়।

খ) ব্যাকটেরিয়ার অপকারি কার্যাবলী

১। মানুষের রোগ সৃষ্টিতে
ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এ সব রোগ সাময়িক অসুস্থতা, দূর্বলতা, পঙ্গুতা বা অকাল মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।
নিচে মানবদেহে রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও রোগের নাম উল্লেখ করা হলো-

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
কলেরা	*Vibrio cholerae*
টাইফয়েড	*Salmonella typhosa*
যক্ষ্মা	*Mycobacterium tuberculosis*
নিউমোনিয়া	*Diplococcus pneumoniae*
ডিপথেরিয়া	*Corynebacterium diptheriae*
আমাশয়	*Bacillus dysenteri*
টিটেনাস	*Clostridium tetani*
কুষ্ঠ (লেপরসী)	*Mycobacterium leprae*
প্লেগ	*Yersinia pestis*
গণোরিয়া	*Neisseria gonorrhoeae* ইত্যাদি

২। গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টিতে ঃ ব্যাকটেরিয়া গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

নিচে গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম ও সংশ্লিষ্ট রোগের নাম উল্লেখ করা হলো–

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
গরু-মহিষের যক্ষ্মা	*Mycobacterium bovis*
হাঁস-মুরগীর কলেরা	*Bacillus avisepticus*
ভেড়ার এ্যানথ্রাক্স	*Bacillus anthracis*
গবাদি পশুর কৃষ্ণপদ (Black leg)	*Bacillus chauvoet*
ইদুঁরের প্লেগ	*Yersinia pestis* ইত্যাদি।

৩। উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিতে

ব্যাকটেরিয়া ফসলী উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। এর ফলে ফসলের ফলন অনেক কমে যায়।

নিচে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রোগ ও সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার নাম উল্লেখ করা হলো–

উদ্ভিদের নাম	রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া
ধান	পাতা ধবসা (leaf blight)	*Xanthomonas oryzae*
গম	টুন্ডু (Tundu)	*Agrobacterium tritici*
লেবু	ক্যাঙ্কার (Canker)	*Xanthomonas citri*
আলু	বাদামী পঁচা (Brown rot)	*Pseudomonas solanacearum*
আখ	আঠা ঝারা (Gummosis)	*Xanthomonas vasculorum*
আলু	রিং রট (Ring rot)	*Corynebacterium sepidonicum*
টম্যাটো	ক্যাঙ্কার (Canker)	*Corynebacterium michiganense*
তুলা	পাতার কৌনিক দাগ	*Xanthomonas malvacearum* ইত্যাদি

৪। খাদ্য দ্রব্যের বিষাক্তকরণে

ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি আমাদের নানাবিধ খাদ্যের বিষাক্তকরণের মাধ্যমে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি করে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা না হলে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হয় এবং পরিণামে পঁচে গিয়ে অখাদ্যে পরিণত হয়। কাঁচা অথবা রান্না করা মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডাল, পাকা ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পঁচে যায় এবং অনেক সময় বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হয়। উদাহরণসরূপ বলা যেতে পারে *Clostridium botulinum* নামের ব্যাকটেরিয়া খাদ্যে বটিউলিন (botulin) নামক বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং এ বিষাযুক্ত খাদ্য খেলে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

৫। মাটির উর্বরতা বিনষ্টে

নাইট্রেট জাতীয় উপাদান মাটিকে উর্বর করে থাকে। কতিপয় নাইট্রেট বিশ্লেষক ব্যাকটেরিয়া মাটিতে অবস্থিত নাইট্রেটকে বিনষ্ট করে। এর ফলে নাইট্রেট থেকে বায়বীয় নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে ফিরে যায় এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়। *Pseudomonas* ও *Micrococcus* এর কতিপয় প্রজাতি এবং *Bacillus denitrificans* (ডি-নাইট্রিফাইয়ং ব্যাকটেরিয়া) প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা হ্রাস করে। এছাড়াও *Thiobacillus thioporus, Thiobacillus denitrificans* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াও নাইট্রেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

৬। পানি দূষণে

বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া পানিকে দূষিত করে এবং দূষিত পানি নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডাইরিয়া প্রভৃতি রোগ দূষিত পানি পানের ফলে হয়ে থাকে। কলিফর্ম, ফেকাল কলিফর্ম, *Salmonella, Shigella, Bacillus, Pseudomonas, Vibrio, Escherichia coli.* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া পানি দূষিতকরণের জন্য দায়ী।

৭। যুদ্ধে ক্ষতিকারণ জীবাণুর ব্যবহার মানব জাতীর জন্য হুমকী স্বরূপ।

সার সংক্ষেপ

- ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার-অপকার দুটাই করে থাকে।
- জীবন রক্ষাকারী এ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রস্তুত করা হয়।
- পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার তুলনাহীন।
- ব্যাকটেরিয়া মৃত জীবদেহ ও আবর্জনা পঁচনের মাধ্যমে এ পৃথিবী পৃষ্ঠকে বাসের উপযোগী করে তুলেছে।
- নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ, প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি করে থাকে।
- ব্যাকটেরিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে পঁচিয়ে অনেক আর্থিক ক্ষতি করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। "সাবটিলিন" নামের এ্যান্টিবায়োটিক নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরী করা হয় ?

ক. *Bacillus polymyxa* খ. *Bacillus subtilin*
গ. *Bacillus sphericus* ঘ. *Bacillus licheniformis*

২। সিরকা বা ভিনেগার নিচের কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরী করা হয়?

ক. *Bacillus lacticacidi* খ. *Clostridium acetobutylicum*
গ. *Acetobacter xylinum* ঘ. *Bacillus subtilis*

৩। কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে?

ক. *Azotobacter* খ. *Rhizobium*
গ. *Bacillus* ঘ. *Vibrio*

৪। *Mycobacterium tuberculosis* নামের ব্যাকটেরিয়া দিয়ে কি রোগ হয়?

ক. কলেরা খ. আমাশয়
গ. ডিপথেরিয়া ঘ. যক্ষ্মা

৫। ধানের পাতা ধ্বসা রোগ নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়ে থাকে?

ক. *Xanthomonas oryzae* খ. *Xanthomonas vasculorum*
গ. *Xanthomonas malvacearum* ঘ. *Pseudomonas solanacearum*

পাঠ- ৭ ঃ সায়ানোব্যাকটেরিয়া

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- সায়ানোব্যাকটেরিয়ার আবাসস্থল ও কোষের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- *Nostoc* এর কোষের গঠন, জনন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

সায়ানোব্যাকটেরিয়া

Cyanobacteria

সায়ানোব্যাকটেরিয়া তথা নীলাভ সবুজ শৈবালগুলির (Blue Green Algae) বিস্তারণ সম্ভবত উষ্ণমন্ডলীয় দেশগুলিতে বেশি। তবে সায়ানোব্যাকটেরিয়া বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জন্মে থাকে। এরা ব্যাকটেরিয়া থেকে আকারে বড় এবং দেখতে নীলাভ সবুজ বর্ণের। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। এদেরকে খুব প্রাচীন এবং আদিম (Primitive) উদ্ভিদ হিসেবে ধরা হয়।

২। এদের বর্ণ নীলাভ-সবুজ, কারণ এদের কোষে সি-ফাইকোসায়ানিন নামের নীল বর্ণকণিকা অধিক থাকে, অন্যান্য কণিকা অল্প পরিমাণে থাকে। তাছাড়া লাল কণিকা সি-ফাইকোইরেথ্রিন এবং সবুজ ক্লোরোফিল-এ কণিকাও থাকে।

৩। এরা আদিকোষী বা প্রোক্যারিওটিক অর্থাৎ এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, এর পরিবর্তে আবরণহীন কেন্দ্রবস্তু থাকে। সাইটোপ্লাজমে ক্লোরোপ্লাষ্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বডি থাকে না।

৪। এরা স্বভোজী, তবে এদের কোন ক্লোরোপ্লাষ্ট নেই। সালোকসংশ্লেষণের বর্ণকণিকা (Pigment) সাইটোপ্লাজমের পরিধীয় অংশে অবস্থিত ফাইলাকয়েড এ থাকে।

৫। এদের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।

৬। এদের কোষের বাইরে পিচ্ছিল আবরণ থাকে।

৭। সায়ানোব্যাকটেরিয়াতে যৌন জনন অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে অঙ্গজ ও অযৌন জনন পরিলক্ষিত হয়।

৮। এদের কোন ফ্লাজেলা নেই।

৯। কোষে প্রকৃত কোষগহ্বর নেই।

১০। এরা এককোষী (মুক্ত বা কলোনীযুক্ত) হতে বহুকোষী শাখান্বিত বা অশাখান্বিত ফিলামেন্ট ধরণের হয়ে থাকে। কোন কোন ফিলামেন্টে হিটারোসিষ্ট নামে বিশেষ কোষ ও অ্যাকিনিটি তৈরী হয়।

১১। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যাকটেরিয়ার মত বাতাসের নাইট্রোজেন কে মাটি বা পানিতে আবদ্ধ করতে সক্ষম।

আবাসস্থল

Habitat

১। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার বিস্তার উষ্ণমন্ডলীয় দেশগুলিতে সম্ভবত সর্বাধিক।

২। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কতক সদস্য ভেজা দেয়াল, যেমন- *Scytonema*; পাথর নুড়ী, গাছের বাকল ইত্যাদি অর্ধ-বায়বীয় আবাস-এ ভাল জন্মে। এরা বড় বড় পাথরের অভ্যন্তরেও জন্মাতে সক্ষম।

৩। এদের কিছু প্রজাতি ভেজা স্যাঁতস্যেঁতে মাটিতে জন্মে থাকে (যেমন- *Porphyridium* sp.)। বর্ষাকালে এরা প্রচুর জন্মে এবং পথঘাট পিচ্ছিল করে দেয় যেমন *Aphanocapsa*।

৪। এদের কতগুলি প্রজাতি পুকুর, ডোবা, নর্দমা ইত্যাদি পরিবেশে জন্মে থাকে।

৫। এরা হাওর, বাওড়, বিল, ঝিল, ধান ক্ষেত (যেমন- *Aulosira* sp.) ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

৬। এদের কিছু কিছু প্রজাতি অন্য উদ্ভিদের ভিতরে এন্ডোফাইটিক হিসেবে জন্মায়। যেমন- *Anthoceros* নামের ব্রায়োফাইটার ভিতরে জন্মায় *Nostoc; Azolla* নামের টেরিডোফাইটার ভিতরে জন্মায়। *Anabaena; Cycas* নামের নগ্নবীজির ভিতরে জন্মায় *Nostoc, Anabaena*।

৭। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কিছু প্রজাতি সমুদ্রের লোনা পানিতে জন্মে।

৮। এরা ছত্রাকের সাথে মিলিত অবস্থায় লাইকেন জাতীয় উদ্ভিদ তৈরী করে।

কোষের গঠন

সায়ানোব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রোক্যারিওটিক বা আদিকোষীয় প্রকৃতির। এদের কোষের গঠন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **পিচ্ছিল আবরণ ঃ** এদের প্রত্যেক কোষের বাইরে আঠালো বা পিচ্ছিল পদার্থের একটি আবরণ আছে। আবরণটি পেপটিক যৌগে গঠিত এবং এটা বর্ণহীন বা বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে।

২। **কোষপ্রাচীর ঃ** কোষপ্রাচীর পাতলা, শক্ত এবং পিচ্ছিল আবরণীর নিচে অবস্থিত। এটি মিউকোপেপটাইড ও কিছু সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।

৩। **কোষঝিল্লী ঃ** কোষ প্রাচীরের নিচে পাতলা ও সজীব কোষঝিল্লী (Plasma membrane) অবস্থিত।

৪। **প্রোটোপ্লাস্ট ঃ** প্রোটোপ্লাস্ট কোষঝিল্লী দিয়ে পরিবেষ্টিত। এর বাইরের অংশ সালোকসংশ্লেষণ কণিকা সমৃদ্ধ, যা ক্রোমোপ্লাজম নামে পরিচিত এবং কেন্দ্রিয় অংশে অগঠিত নিউক্লিয়াস আছে। ক্রোমোপ্লাজমের বর্ণকণিকায় সি-ফাইকোসায়ানিন, সি-ফাইকোইরিথ্রিন, ক্লোরোফিল-এ, জ্যান্থফিল এবং ক্যারোটিন প্রধান।

৫। **গ্যাস গহ্বর ঃ** কোন কোন সায়ানোব্যাকটেরিয়া কোষে অসংখ্য ছোট ছোট গ্যাস গহ্বর আছে। এরা সিউডোভ্যাকুউল (Pseudovacule) নামে পরিচিত।

৬। **সঞ্চিত খাদ্য ঃ** সায়ানোব্যাকটেরিয়া কোষে সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেনরূপে জমা থাকে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Economic Importance

সায়ানোব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার ও অপকার দুটাই করে থাকে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

উপকারিতা

১। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অনেক প্রজাতি জলাশয়ে প্রাথমিক ফুড প্রোডিউসার হিসেবে মাছের খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

২। বিভিন্ন ধরনের সায়ানোব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Nostoc, Anabaena, Aulosira* ইত্যাদি) মাটিতে ও পানিতে বায়ুমন্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন (N_2-fixation) করে ঐসব পরিবেশের উর্বরা শক্তি বাড়ায়। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে ধান ক্ষেতে এদের ব্যপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

অপকারিতা

১। কিছু সায়ানোব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Microcystis*) পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মে ওয়াটার ব্লম (Water bloom) সৃষ্টি করে। এতে পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ে এবং এ পানি পানের ফলে মানুষ ও অন্যান্য পশুর মৃত্যুও হতে পারে।

২। সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মরণ ও পঁচনের ফলে পানির ট্যাংক ও অন্যান্য পানির আধার দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে।

৩। কিছু প্রজাতির সায়ানোব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Porphyridium*) বর্ষাকালে প্রচুর জন্মে এবং এর ফলে কাঁচা রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যায়, যা পথচারীর চলাচলের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

৪। অর্ধ বায়বীয় সায়ানোব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Scytonema*) কাঁচা ও পাকা দেওয়ালে প্রচুর জন্মে এবং দেওয়াল নষ্ট করে ফেলে।

Nostoc Spp.

Nostoc (নস্টক) একটি অতি পরিচিত সায়ানোব্যাকটেরিয়াম। বাংলাদেশে *Nostoc* -এর কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায়, যেমন- *Nostoc linkhia, Nostoc ellipsosporum.*

আবাসস্থল

Nostoc; পানি, ভিজা মাটি এবং ভিজা অর্ধ বায়বীয় স্থানে (যেমন- ভিজা দেওয়াল, ভিজা গাছের বাকল ইত্যাদি) -এ জন্মে থাকে। *Nostoc* -এর সূত্রগুলো কখনো এককভাবে বাস করে না, বরং জিলাটিন জাতীয় পদার্থের আবরণে আবৃত হয়ে *Nostoc* -এর সূত্রগুলো একত্রিত হয় এবং গোলাকার কলোনী তৈরী করে। *Nostoc* -এর জলজ প্রজাতিগুলো আলোকযুক্ত স্বচ্ছ হ্রদ, পুকুর, ঝরনা এমনকি ছোট খাল, নালা-ডোবাতে মুক্ত ভাসমান অবস্থায় বা জলমগ্ন কোন উদ্ভিদের সাথে আবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করে। *Nostoc* -এর কোন প্রজাতি *Anthoceros* নামক ব্রায়োফাইটার থ্যালাসের নিম্নভাগে এন্ডোফাইটিক হিসেবেও জন্মে।

গঠন

Nostoc-এর দেহ একটি অশাখ সূত্রক বা ফিলামেন্ট দিয়ে গঠিত। সূত্রক বা ফিলামেন্টটি একটি মাত্র ট্রাইকোম (trichome) দিয়ে গঠিত। (সূত্রময় একসারি কোষকে ট্রাইকোম বলে। পিচ্ছিল পদার্থ দিয়ে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক ট্রাইকোমকে ফিলামেন্ট বলে)।

Nostoc -এর বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অসংখ্য সূত্র বা ট্রাইকোম ঘনিষ্ঠভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এবং জিলটিন জাতীয় পদার্থের দিয়ে আবৃত হয়ে *Nostoc* কলোনী গঠন করে। *Nostoc* এর প্রত্যেকটা ফিলামেন্ট দেখতে অনেকটা তসবী দানা বা পুতির মালার ন্যায়। প্রত্যেকটা ফিলামেন্ট অনেকগুলো কোষ দিয়ে গঠিত। কোষগুলো গোলাকার, নলাকার বা পিপাকৃতির হতে পারে। ফিলামেন্টের স্থানে স্থানে দুপ্রাচীর বিশিষ্ট, স্বচ্ছ এবং দেহকোষ থেকে বড় আকারের বিশেষ কোষ দেখা যায়, এদেরকে হেটেরোসিষ্ট (heterocyst) বলে। প্রত্যেকটা দেহকোষের বাইরে জড়কোষ প্রাচীর, কোষঝিল্লী দিয়ে আবদ্ধ পরিধীয় ক্রোমোপ্লাজম এবং কেন্দ্রিয় নিউক্লিওবস্তু উপস্থিত থাকে।

চিত্র ২.১১ ঃ *Nostoc* -এর গঠনাকৃতি; বাঁয়ে-কতকগুলো ফিলামেন্ট একসাথে এবং ডানে-একটি ফিলামেন্টের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

বংশবৃদ্ধি বা জনন

Reproduction

Nostoc -এর জনন সম্পূর্ণরূপে অঙ্গজ। ফিলামেন্টের খন্ডায়ন, অ্যাকাইনিটি সৃষ্টি এবং কোন কোন সময় হেটেরোসিস্ট-এর মাধ্যমেও নস্টক বংশবৃদ্ধি করে থাকে। (প্রচুর সঞ্চিত খাদ্য ও প্রোটোপ্লাস্ট বিশিষ্ট রেস্টিং স্পোরকে অ্যাকাইনিটি (akinete) বলে।

১। খন্ডায়ন বা হর্মোগোনিয়াম সৃষ্টি ঃ ঝড়, ঝঞ্ঝা, স্রোতের প্রাবল্য অথবা অন্য নানাবিধ কারণে বৃহৎ ফিলামেন্ট ভেঙ্গে গিয়ে কয়েকটি হর্মোগোনিয়াম (পৃথককৃত পর্দা দিয়ে আলাদা করা ট্রাইকোমের প্রত্যেকটা অংশকে হর্মোগোনিয়াম বলে) সৃষ্টি করে। তখন প্রতিটি হর্মোগোনিয়াম এর কোষগুলির বিভাজনের মাধ্যমে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় এবং এক একটি স্বতন্ত্র ফিলামেন্টে পরিণত হয়।

২। অ্যাকাইনিটি সৃষ্টি ঃ পানির স্বল্পতা, অসুবিধাজনক তাপমাত্রা প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশে ট্রাইকোমের এক বা একাধিক কোষ পুরু ও শক্ত প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ হয়ে অ্যাকাইনিটি গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে অ্যাকাইনিটি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন ফিলামেন্ট গঠন করে।

৩। এন্ডোস্পোর সৃষ্টি ঃ *Nostoc* -এর কোন কোন প্রজাতিতে হেটারোসিস্ট প্রোটোপ্লাস্টের বিভাজনের ফলে চারটি এন্ডোস্পোর গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে এন্ডোস্পোর থেকে নতুন ফিলামেন্টের সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

Economic importance

Nostoc, প্রাথমিক খাদ্য-উৎপাদক হিসেবে জলাশয়ে মাছ চাষে সাহায্য করে। এরা বায়ুমন্ডল থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন সংবন্ধন (N_2-fixation) করতে পারে, ফলে মাটি ও জলজ পরিবেশ উর্বর হয়। ধান ক্ষেতে *Nostoc* চাষের মাধ্যমে রাসায়নিক সার (যেমন- ইউরিয়ার) -এর ব্যবহার কমানো সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

- সায়ানোব্যাকটেরিয়াকে নীলাভ সবুজ শৈবাল বলা হয়।
- এদের কোষে নীল বর্ণ কণিকা সি-ফাইকোসায়ানিন থাকার কারণে কোষের বর্ণ নীলাভ সবুজ হয়।
- এতে যৌন জনন অনুপস্থিত। প্রধাণত অঙ্গজ ও অযৌন প্রক্রিয়ায় এদের বংশবৃদ্ধি করে।
- সায়ানোব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবদ্ধনের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭

সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নীচের কোনটি সায়ানোব্যাকটেরিয়া?

ক. *Micrococcus* sp.
খ. *Bacillus* sp.
গ. *Pseudomonas* sp.
ঘ. *Aulosira* sp.

২। সায়ানোব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের শৈবালের অন্তর্ভুক্ত?

ক. সবুজ বৈবাল
খ. নীলাভ-সবুজ শৈবাল
গ. লোহিত শৈবাল
ঘ. লাল শৈবাল

৩। *Nostoc* -এর কোন প্রজাতি বাংলাদেশে পাওয়া যায়?

ক. *Nostoc ellipsosporum*
খ. *Nostoc paluosum*
গ. *Nostoc commune*
ঘ. *Nostoc spherium*

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। ভাইরাস কি? ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
২। ভাইরাস জীব না জড় এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৩। ব্যাকটেরিওফাজ কি? T_2 -ব্যাকটেরিওফাজের গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
৪। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৫। ব্যাকটেরিয়া কি? আকার ও আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস উল্লেখ করুন।
৬। একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষের বর্ধিত চিত্র অঙ্কন করুন এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করুন।
৭। ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

৮। টীকা লিখুন-

ক) ভাইরাস
খ) ব্যাকটেরিওফায্
গ) ব্যাকটেরিয়া
ঘ) সায়ানোব্যাকটেরিয়া

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক